আশূরার হাকীকত

০১. যমান ও মকানের খাস ফযীলত আছে। খোদ আল্লাহ সেটা ভাল জানেন। সে হিসাবে অতি শুরু থেকেই চার মাসের কথা কুরআন শরীফে উল্লেখ আছে। শাহরুল্লাহ মুহাররমুল হারাম, রজবুল মুরাজ্জাব, যুল কা'দা ও যুল হাজ্জা।

০২. মানুষ বলতে দুই জিনিস। শরীর ও রূহ। ইবাদত তাই দুই ক্ষেত্রে। শরীর ও রূহকে নিয়ে। নামায পূর্বকাল থেকেই আছে। এটি ছিল শরীরের ইবাদত। আর রূহের প্রধান আমল হল রোযা। এটিও পূর্বকাল থেকে আছে। আগে এর টাইম ছিল এই মুহাররম মাস। বিশেষত মুহাররমের ১০ তারিখ। রমযান স্পেশাল নিয়ামত উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য। রমযানের হুকুম নাযিল হওয়ার আগে খোদ নবী আ. ও সাহাবীগণ মহররমের রোযা রাখাতেন। বাদ রমযান বিধান পরিবর্তিত হল। মুহাররম আর ফরয থাকলো না। সময়টার বরকত ধরে রাখার জন্য একটি রোযা তাও ১০ তারিখ রাখা সুন্নাত হিসাবে বরং আহাম্ম সুন্নাত হিসাবে রয়ে গেল।

== এটাই হল মুহাররমের মূল হাকীকত। যেন পুরাতন রাজবাড়ী। দিল্লীর লালকিল্লা কিংবা ঢাকার নবাব বাড়ী ইত্যাদি। হাজারো সুবিধার দিক বিচার করে এখানে রাজবাড়ী তৈয়ার করা হয়েছে। যদিও যুগের নানাবিদ সুবিধার কথা বিবেচনা করে পরে নয়াদিল্লী বা নতুন ঢাকা স্থাপন করা হল।

== মুহাররম মাস বা আশূরার ফযীলত সহীহ নস দ্বারা ছাবিত এতটুকুই আমলের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু উলামা আরো গভীরে হেঁটে খুজতে চেষ্টা করেছেন যে, মুহাররমের এত ফযীলত কেন হল। সেটি ঘাটতে গিয়ে অনেক কারণ উল্লেখ করেছেন যথা সেদিন হযরত আদম

দুনিয়ায় আসছেন, সেদিন কিয়ামত হবে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি বলা হয় তবে এগুলির সনদ খুব শক্ত নয়। তাই রেজাল্ট হল; আছল ছাবিত আছে। তবে যারাযে বা অজুহাত সব হল দুর্বল ও মাশকূক।

০৩. রামাদানের সিনিয়র ফযীলত নাযিল হয়ে গেলে আশূরার বরকত যে খতম হয়ে গিয়েছে তা নয়। পুরান ঢাকার জায়গা- আধুনিক ঢাকা নির্মান হয়ে গেল বলে পুরাতন ঢাকায় জমিজমার দাম যে জিরো হয়ে গিয়েছে তা নয়। স্রেফ এতটুকু যে বিধান ফরযিয়্যাতের মাকাম থেকে সুন্নাত বা মুস্তাহাবের মাকামে চলে আসছে। কম বা সামান্য হলেও পুরান বাড়ীর ভাড়া বটে। নষ্ট কেন করা হবে। কোন সওয়াবকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। রাসূল সা, তাই রামাদানের পাশাপাশি আশূরার রোযাকেও খুব গুরুত্বের সাথে দেখতেন। আমাদের বুযর্গানে দীন সেই বারো তাসবীহ ও মোরাকাবার আমল শেষ জীবন পর্যন্ত ধরে রাখতেন- অনেকটা নফল হিসাবে; তা এই কারনেই।

০৪. আশূরার আমল যেহেতু রোযা আর রোযার মধ্যে খাওয়া দাওয়া একটু মান সম্মত রাখা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বটে। তাই হাদীসে এই দিনে পরিবার পরিজনের জন্য উত্তম আহারের আয়োজন শরীঅত পছন্দের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। হাদীসে পাকে বলা হয়েছে;

مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِيْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ فِيْ سَنَتِهِ كُلِّهَا

"যে ব্যক্তি আশূরার দিনে তার পরিবারের জন্য প্রশস্তভাবে খরচ করবে, আল্লাহ সারা বছর সে ব্যক্তিকে প্রশস্ত রিয্ক প্রদান করবেন।"

আশূরার দিনে সুরমা ব্যবহার। একটি হাদীসে বলা হয়েছে:

مَنِ اكْتَحَلَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ بِالإِثْمِدِ، لَمْ تَرْمُدْ عَيْنُهُ أَبَداً

''যে ব্যক্তি আশূরার দিনে চোখে 'ইসমিদ' সুরমা ব্যবহার করবে কখনোই তার চোখ উঠবে না।''

০৫. সওমে রামাদান নাযিল হয় হিজরী ২য় বছর। নবী আ. ওফাত পর্যন্ত মোট ৯টি রামাদান লাভ করেছেন। নুযূলে রামাদানের আগে বা পরে নবী আ. সওমে আশূরা পালন সম্পর্কে যা করতেন তা হল; নুযূলে রামাদানের আগে তিনি;

০১. নবী আ. নিজে খুব ইলতিযামের সাথে আশূরার রোযা রাখতেন। সাহাবীদেরকে রোযার তাকিদ দিতেন। খুব তাকিদ দিতেন। নিজেও আশূরার তাহাররী করতেন। একবার মুহাররমের দশ তারিখ সকাল বেলা সাহাবী সালমা ইবনুল আকওয়াকে ব্যাপক ঘোষণার আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে বললেন, আজ আশূরার দিন। তোমরা যারা আহার করে নিয়েছো, আহার বন্ধ রাখো। আর যে আহার করোনি সে পূর্ণ রোযার নিয়্যত করে নাও। সেই আমলে শিশুরাও রোযার আমল করতো। মা বাবা তাদের জন্য খেলনা কিনে দিতো। যেন তারা ক্ষুধার কথা ভুলে থাকতে পারে। সে সময়ে একবার উমর ইবনুল খাত্তাব সাহাবী হারিস ইবনে হিশামকে বলে পাঠালেন যে, আগামী কাল আশূরা। কাজেই আগামী কাল তুমিও রোযা রাখবে তোমার পরিবার পরিজনকেও রোযার হুকুম দিবে। সওমে রামাদান আসার পর আর সেই তাকিদ দিতেন না।

০২. অন্যদেরকেও আশূরার রোযার আদেশ দিতেন। যদিও পরবর্তী সময়ে সেটি সম্পূর্ণ ইখতিয়ারী বিষয় হয়ে গিয়েছিল।

০৩. কুরাইশ আশূরার পবিত্রতার কথা খেয়াল করে সেই দিনে নিজেরা রোযা রাখতো এবং কাবা শরীফের নতুন গিলাফ লাগানো হতো।

০৪. রামাদান ফরয হওয়ার পর নবী আ. বললেন, আশূরার দিবস মহান আল্লাহর নির্বাচিত দিবসসমূহের অন্যতম বটে। এর ফযীলত

যথারীতি অব্যাহত আছে তবে রোযা রাখা আবশ্যক নয়। তোমাদের যার ইচ্ছা রোযা রাখতে পারো যার ইচ্ছা নাও রাখতে পারো।

০৫. আশূরা ইখতিয়ারী ঘোষিত হওয়ার পর কোন কোন সাহাবী (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) নিজেদের মা'মূলের সাথে মিলে গেলে রোযা রাখতেন নতুবা রাখতেন না।

০৬. খাইবার অধিবাসী ইয়াহূদীরা আশূরাকে খুব ঝাকঝমকের সাথে পালন করতো। তারা এটিকে ঈদ গন্য করে পরিবার পরিজনের মধ্যে নতুন পোশাক ইত্যাদির খুব সাজ সজ্জা করতো। তাদের কাছে এটি ফেরআউনের কবল থেকে উদ্ধার প্রাপ্তির নাজাত দিবস হিসাবে গন্য ছিল।

আশূরা ফরযিয়্যাত থেকে নফলিয়্যাতে চলে আসার পর তার সাথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যুক্ত হয়। তা হল হযরত মূছা আ. এর সাথে এই উম্মতের নিসবত বৃদ্ধির একটা সুযোগ। প্রত্যেক বাবা চায়, নিজ সন্তানদের কিভাবে আরো সমৃদ্ধ করে দিয়ে যাওয়া যায়। নিসবতের কাছরত রূহকে আরো বেশী সমৃদ্ধ করে থাকে। নবী আ. মদীনা শরীফ আসার পর দেখলেন, বনী ইসলাঈল মুহাররমের ১০ তারিখ রোযা রাখেন। কারণ হল আল্লাহ পাক মূছা আ.কে এই দিনে ফিরআউনের কবল থেকে মুক্ত করে ছিলেন। শুকরিয়া হিসাবে। নবী আ. নিজ উম্মতকে হযরত মূছা আ. এর সাথে নিসবত বৃদ্ধির এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হতে দিলেন না। কাজেই বললেন, হযরত মূছা আ. এর সাথে ইহূদীদের তুলনায় সম্পর্ক আমাদের আরো বেশী। কাজেই আমরা আশূরা উপলক্ষে আমরা দুটি রোযা রাখবো। কিন্তু পরবর্তী বছর আর নবী আ. জীবিত ছিলেন না। তা ছাড়া দুই রোযা রাখার আদেশ প্রদানের আরো কারণ হলো ইয়াহূদীদের সাথে নিজেদের আমলে ভিন্নতা রক্ষা করা।

== নিসবত একটা বিরাট জিনিস। তাও এক জলীলুল কদর পয়গাম্বরের সাথে। নিসবত মানুষকে দামী বানায়। শান বৃদ্ধি করে। খোদ মূছা আ. নিজেও তো নিসবত বৃদ্ধির জন্য মিরাজের সময় রাস্তায় দাড়িয়ে বার বার নবী আ. এর সাথে দেখা করেন। ৯ বার দেখা করেন, নামাযের ওয়াক্ত সংখ্যা কমিয়ে আনেন, উম্মতের হাল জানান, - এ সব আসলে করেছিলেন নিসবত তথা সম্পর্ককে উন্নয়ন করার জন্য। -- এক বর্ণনায় আছে যে, মূছা আ. দীদারে এলাহীর জন্য বড় বেকারার ছিলেন। কিন্তু হালাতের মেচিউরেটি না থাকার দরুন দীদার যেভাবে চেয়ে ছিলেন সেভাবে পাননি। তাই দুধের স্বাধ ঘোলে মিটানোর মত; নিজে দীদার পাননি অন্তত দীদার পেয়েছেন এমন কারো দীদারের জন্য তিনি মিরাজে নবী আ. এর সাথে বারবার দেখা করেন। -- আশিকদের নীতি পদ্ধতিই ভিন্ন রকমের হয়।

-----

০৬. আশূরার ফযীলত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আশূরার রোযার দ্বারা পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। বলা হয়েছে যে, ফরয নামাযের পর তাহাজ্জুদ নামাযের যেমন শ্রেষ্ঠত্ব তেমনি রামাদানের পর আশূরার রোযার তেমনি শ্রেষ্ঠত্ব। বলা হয়েছে, এই দিনে একটি কওমকে যেভাবে তিনি ক্ষমা করেছেন তদ্রুপ অন্যান্য কওমকেও তিনি ক্ষমা করে থাকেন। বলা হয়েছে, এটি এমন দিবস যে দিবসে পূর্বেকার নবীগন রোযা রাখতেন। (কাজেই সেদিন রোযা রাখার মাধ্যমে সকল নবীদের সাথে নিসবত কায়েম হয়ে যায়)

------

০৭. কারবালার ঘটনাঃ ওফাতে নববীর অর্ধ শতাব্দী পর ৬১ হিজরীর ১০ মুহাররম হযরত হোসাইন কারবালার প্রান্তরে নির্মম ভাবে

শাহাদত লাভ করেন। বড় লোমহর্ষক ঘটনা। হৃদয় বিদারক ঘটনা। -- শাহাদতে হোসাইন দ্বারা হযরত হোসাইন মাকামে আলীয়া লাভ করেন আর ইয়াজীদ ইতিহাসে চির ধিকৃত হয়ে যায়। - শাহাদতে হোসাইন আছল মে মুরগে ইয়াজীদ হ্যায়। কারবালার এই ঘটনা আমাদের জন্য বেদনা বিদুর বটে। তবে এটি মুহাররমের ফযীলতের কারন নয়।

০৮. মুহাররমের শোক ও মাতম। আমাদের মাওকাফ হলো; হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ হবে কিন্তু আচরনে শরীঅত সুন্নাতের খেলাফ কোন কথা বা কাজ করা যাবে না। হযরত হোসাইন হক ও ন্যায়ের পথে লড়াই করেছেন, নিজ নানাজানের রেখে যাওয়া শরীঅত ও সুন্নাতের সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য লড়াই করেছেন। বৈষয়িক কোন স্বার্থের জন্য লড়াই করেননি। প্রতিপক্ষের লোকেরাও যেহেতু মুসলিম সেহেতু তারা এই যুদ্ধে আরো সাবধানতার সাথে চলা উচিত ছিল। তারা সেটা না করে বড় অমানবিক ও বেঈমানদের মত আচরণে মত্ত হয়ে অতি নির্মমভাবে হযরত হোসাইনকে শহীদ করে দেয়। এতে কোন মুসলিমের অন্তর ভারাক্রান্ত হবে না? ভারক্রান্ত হওয়াই হল ঈমানের দাবী। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, দুঃখিত হয়ে আবার শরীঅতের বরখেলাপ কাজ করা যাবে না। শরীঅত সুন্নাতের বাইরে যাওয়া যাবে না। এমতবস্থায় কেউ যদি আবেগের বশীভূত হয়ে শরীঅত সুন্নাতের খেলাপ কাজে লিপ্ত হয়ে গেল তাহলে উল্টা আল্লাহর হাবীবের মনে কষ্ট চলে আসবে। স্বয়ং আল্লাহ নাখোশ হয়ে যাবেন। খোদ হযরত হোসাইনের রূহ তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

ইয়াযীদ ও তার দোসরদের যারা এই অবিচারের সাথে যুক্ত ছিল আমরা তাদের প্রতি দারুন নাখোশ। মুসলমান হয়ে আওলাদে রাসূলের সাথে তাদের এই আচরণ তা ক্ষমার অযোগ্য, ক্ষমার অযোগ্য, ক্ষমার অযোগ্য। হযরত হোসাইন কেন, সাধারণ কোন মুসলমানের সাথেও

এমন আচরণ কেউ করবে সেটা ইসলামের শিক্ষা নয়। আমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতের ভিন্নতা থাকতে পারে কিংবা আসতে পারে। তবে এই মতোবিরোধকে এতটা নিন্দিত পরিনামে টেনে আনাকে আমরা হাজার কণ্ঠে বলবো, কিয়ামত পর্যন্ত বলতে থাকবো যে, এটা নেহায়েত অমানবিকতা ও অতি বড় জুলুমের আচরণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হযরত হোসাইন রাযি আল্লাহু আনহু আযীমতের উপর আমল করেছেন। আওলাদে রাসূল হয়ে রুখসাতের উপর তিনি কেন আমল করবেন? সেই আযীমতের পথ ধরে তিনি ত্যাজদীপ্ত ঈমানের যে স্বাক্ষর রেখেছেন, আখিরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিয়ে চলার যে আদর্শ তিনি স্থাপন করে গিয়েছেন = মানে নিজে শাহাদতের উচ্চ মাকাম বেছে নিয়েছেন তবুও শরীঅতের বরখেলাফ কাজের সাথে আপোশ করেননি- এটাই আমাদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয়। কারবালার ঘটনায় হযরত হোসাইন আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, প্রয়োজনে নির্মম থেকে নির্মম শাহাদতের পথে জীবন বিলিয়ে দাও তবুও ওরাসাতে নবুওয়াতের মধ্যে আদনা খিয়ানতকেও মেনে নিও না। == ইসলাম যিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কে বাদ।

কিন্তু আমাদের সমাজে আজো কারবালার ঘটনায় যা ছিল আমাদের শিক্ষনীয় বিষয় মানে ০১. জীবনের কোন বাঁকে আমরা শরীঅত সুন্নাতের বাইরে যাবো না; ০২. জায়িজ মতবিরোধের ক্ষেত্রে মানবতাবোধের সীমানা রক্ষা করে চলবো, প্রান্তিক সীমায় নিজকে ঠেলে দিবো না। মানে ই'তিদালে থাকবো; ইফরাত বা তাফরীত করবো না। - আপসুস! এই শিক্ষা ধারণ করতে রাজি নয়।

প্রশ্ন করা হয় যে, ঠিক আছে ঘটনা প্রবাহের সময় হযরত হোসাইন নিজে থেমে গেলেই তো হতো। (এজিদ বেটায় শাসন চালিয়ে যেতো। আর কারবালার পরে সে তো খুব বেশী দিন বেঁচেও থাকেনি। লোকজনও

হানাহানি থেকে রক্ষা পেয়ে যেত।) জবাব এই ধরনের পরিস্থিতিতে ছাহিবে আযীমত কোন মানুষ থামতে পারে না। শাহাদতে উসমানের সময়ে হযরত উসমান রা. ঠিক এমনই পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। তখন তিনি দায়িত্বভার ছেড়ে দিয়ে পেছনে হটে যেতে পারতেন। কিন্তু সেটা আযীমত থাকতো না। সেটা হয়ে যেত কাপুরুষতা। তদ্রুপ হযরত হোসাইন থেমে গেলে জুলুমের সামনে আযীমতের পরাজয় ঘটে যেত। আর জুলুম দেখে আসহাবে আযীমত যদি এভাবে হটেই যান তাহলে দীন তো এখানেই খতম হয়ে গেল। তাই এটা শরীঅত পছন্দ করেনি।

ইসলামী দর্শন বরাবরই জীবনের চেয়ে আদর্শকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে বেশী। রক্তের চেয়ে নীতি নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে বেশী। ইসলাম মানুষের জীবনকে ভালবাসে তবে তার চেয়ে বেশী ভালবাসে আদর্শকে, নীতি নৈতিকতাকে। এ জন্য কখনো জীবন রক্ষা করা হবে নাকি নীতি রক্ষা করা হবে এমন ক্ষেত্রে ইসলাম ও মুসলিম বান্দা নীতিকে অগ্রাধিকার দেয়; জীবনকে নয়। এখানেই ইসলামের সাথে দুনিয়াদার লোকদের ব্যাবধান। দুনিয়াদার বস্তুবাদী লোকেরা দীনদারী, নীতি নৈতিকতা, আদর্শ ইত্যাদিকে সর্বোচ্চ জীবনের অলংকার মনে করে, জীবনের চেয়ে বেশী দামী মনে করতে পারে না। আর এ জন্য বস্তুবাদী দুনিয়াদার গবেষেকরা কারবালা বা মুশাজারাতে সাহাবার গবেষণায় সঠিক ও যথাযথ রেজাল্টে পৌঁছতে পারে না। == বস্তুবাদীদের কাছে জীবনের জন্য হল ধর্ম। ধর্মের জন্য জীবন নয়। আর ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মের জন্য হল জীবন, জীবনের জন্য ধর্ম নয়।

=====

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

قال ابن كثير . وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة : ثلاث سرد . وواحد فرد لأجل أداء مناسك الحج والعمرة فحرم قبل الحج شهراً وهو ذو القعدة يقعدون فيه عن القتال وحرم شهر ذى الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ، ويشتغلون بأداء المناسك ، وحرم بعده شهرا آخر هو المحرم ، ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين ، وحرم رجب فى وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب ، فيزوره ثم يعود إلى وطنه آمنا.

وعن قتادة : إن الله اصطفى صفيا من خلقه ، اصطفى من الملائكة رسلا ، ومن الناس رسلا ، واصطفى من الكلام ذكره ، واطفى من الأرض المساجد واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم ، واصطفى من الأيام يوم الجمعة واصطفى من الليالى ليلة القدر ، فعظموا ما عظم الله ، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم . . فإن قال قائل : فإن كان الأمر على ما وصفت ، فقد يكون مباحا لنا ظلم أنفسنا فى غيرهن من سائر شهور السنة.

قيل : ليس ذلك كذلك ، بلذلك حرام علينا فى كل وقت ولكن الله عظم حرمة هؤلاء الأشهر وشرفهم على سائر شهور لاسنة : فخص الذنب فيهن ، بالتعظيم كما خصهن بالتشريف ، وذلك نظير قوله - تعالى) - حَافِظُواْ عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى (ولا شك أن الله قد أمرنا بالمحافظة على الصلوات المفروضات كلها بقوله) : حَافِظُواْ عَلَى الصلوات (ولم يبح ترك المحافظة عليهن بأمره بالمحافظة على الصلاة الوسطى ، ولكنه تعالى - زادها تعظيما ، وعلى المحافظة عليها توكيداً ، وفى تضييعها تشديداً ، فكذلك فى قوله) مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلك الدين القيم فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. (

قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ، أخبرنا أيوب ، أخبرنا محمد بن سيرين ، عن أبي بكرة ، أن النبي - ﷺ - خطب في حجته ، فقال : ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ، السنة اثنا عشر شهرا ، منها أربعة] حرم ، ثلاثة [متواليات : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان . ثم قال : أي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى . ثم قال : أي شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : أليس ذا الحجة ؟ قلنا : بلى . ثم قال : أي بلد هذا ؟ . قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : أليست البلدة ؟ قلنا : بلى . قال : فإن دماءكم وأموالكم - قال : وأحسبه قال : وأعراضكم - عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ، ألا هل بلغت ؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب منكم ، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه.

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

=====

০১. যমান ও মাকানের খাস ফযীলত আছে; দলীল

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

===

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَاۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1(

﴿ الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ ﴾، بِالْأَنْهَارِ وَالْأَشْجَارِ وَالثِّمَارِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: سَمَّاهُ مُبَارَكًا لِأَنَّهُ مَقَرُّ الْأَنْبِيَاءِ وَمَهْبِطُ الْمَلَائِكَةِ وَالْوَحْيِ وَمِنْهُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .﴾